সুযোগ দিয়েছিল মার্কিন প্রশাসন।

ঠান্ডাযুদ্ধোত্তর ভারত-মার্কিন বহুমাত্রিক সম্পর্ক

ঠান্ডাযুদ্ধ সমাপ্তির পরে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক নতুন দিকে মোড় নেয়। অতীতের উত্তেজনা ও শত্রুতার পরিবর্তে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে আসে গতিশীলতা ও বন্ধুত্বের বাতাবরণ। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পরে উত্তরসূরি রাষ্ট্র রাশিয়ার আর্থিক অবস্থা এতটাই দুর্বল ছিল যে, অভ্যন্তরীণ সংকটমোচনের জন্য পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। তাই ভারতের কাছে বিকল্প ছিল একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে নেহরুর প্রভাবে যে আদর্শবাদী বিদেশনীতি গ্রহণ করেছিল, সেই আবহ থেকে ভারতের বিদেশনীতির মুক্ত হওয়া দরকার ছিল। বাস্তব রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও জাতীয় স্বার্থের টানে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করেছিল এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে। যাইহোক, ঠান্ডাযুদ্ধোত্তর কালে ভারত-মার্কিন ঘনিষ্ঠতা যে সকল কারণে দৃঢ় হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—বিশ্বায়নের প্রভাব, বাজার অর্থনীতি, তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে পারস্পরিক আগ্রহ, প্রতিরক্ষা ও কৌশলগত ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা, সন্ত্রাসবাদ দমনে দ্বিপাক্ষিক উৎসাহ, অসামরিক পরমাণুশক্তির ক্ষেত্রে সহযোগিতা স্থাপন, মানবাধিকার ও মারণ রোগের বিরুদ্ধে প্রচার প্রভৃতি বিষয়ে। যাইহোক, উভয় দেশই পরস্পরের প্রতি আগ্রহ দেখাতে শুরু করেছিল। ভারত যেমন অতীতের রক্ষণশীল ও গোঁড়া নীতি থেকে বের হয়ে এসেছিল, নৈতিকতা ও মতাদর্শ অপেক্ষা বাস্তবতাকে গুরুত্ব দিতে শুরু করেছিল, অনুরূপভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও অতীতের ভারত বিরোধিতার নীতি থেকে সরে এসে সম্ভাবনার দিকগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে ভারতকে এক উদীয়মান বিশ্ব শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। কিছু কিছু বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে জটিলতা ও তিক্ততার উদ্ভব হলেও সার্বিকভাবে সম্পর্কের গতি-প্রকৃতি ইতিবাচক বলা যায়। ঠান্ডাযুদ্ধোত্তর ভারত-মার্কিন সম্পর্ককে কয়েকটি দিক দিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক সম্পর্ক ঃ ঠান্ডাযুদ্ধের সমাপ্তির পরে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন ঘটেছে। ঠান্ডাযুদ্ধের সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভারত বিরোধী নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। সোভিয়েত ঘনিষ্ঠতা কাটিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন

Scanned with CamScanner

শুরু করায় ধীরে ধীরে কূটনৈতিক সম্পর্ক উষ্ণতর হতে শুরু করেছিল। প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধে (১৯৯১) ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন করেছিল। বিশ্ব রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখার জন্য ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশেরই প্রয়োজন ছিল উভয়ের। দক্ষিণ এশিয়ায় চিনের প্রভাব খর্ব করার জন্য ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সখ্যতা প্রয়োজন ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। পাশাপাশি চিনকে চাপে রাখার জন্য ভারতেরও প্রয়োজন ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিন ও পাকিস্তান নীতি ভারতের নিকট উদ্বেগের কারণ ; তাই ভারত-মার্কিন কূটনৈতিক সম্পর্ক এক বহুমাত্রিক ও জটিল বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিন একচ্ছত্র আধিপত্য নিয়ে ভারত ওয়াকিবহাল ছিল বরাবরই। কিন্তু কূটনৈতিক সম্পর্ক বন্ধুত্বের আস্তরণে রাখার জন্য ভারত বহুক্ষেত্রে মার্কিন নীতির সমালোচনা করেনি ঠান্ডালড়াই উত্তর পর্বে যেমন ঃ ২০০৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইরাক আগ্রাসন, ইরানের প্রতি মার্কিন হুমকি প্রভৃতি। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে স্থায়ী সদস্যপদ পাওয়ার জন্য ভারতের প্রয়োজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন। ভারত প্রযুক্তিগত স্বার্থে এমনকি জ্বালানি স্বার্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নমনীয় কূটনীতি বজায় রেখেছে ঠান্ডাযুদ্ধোত্তর পর্বে। ১৯৯৬ সালে CTBT, ১৯৯৮ সালে পোখরান-২ ও ২০১৩ সালে দেবযানী খাবড়েগাড়ে কাণ্ড বাদ দিলে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি কড়া কূটনৈতিক পদক্ষেপ নেয়নি। সমালোচকদের একটি অংশ মনে করেন, বাস্তববাদী কূটনীতি ও বিদেশনীতির চক্করে ভারত মেরুদণ্ডহীন না হয়ে পড়ে। যাইহোক, ভারত-মার্কিন কূটনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ় হোক এটা চায় না চিন ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রই। ভারত অবশ্য কূটনৈতিক দিক দিয়ে সফলই হয়েছে বলা যায়। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে 'বিশ্বস্ত অংশীদার' রূপে স্বীকৃতি দিয়েছে, যেটা পাকিস্তানকে দেওয়া হয়নি। বরং দীর্ঘদিনের মিত্ররাষ্ট্র পাকিস্তানকে ভারতের চাপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র' রূপে ঘোষণা করেছে। এটা পরোক্ষ হলেও ভারতের নিকট একটি কূটনৈতিক জয়। ২০০০ সালে বিল ক্লিন্টন ভারত সফরে এসে সাংস্কৃতিক কূটনীতি বৃদ্ধির প্রতি জোর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, "I have read that one of the unique qualities of Indian classical music and its elasticity. The composer lays downs a foundation, a structure of melodic and rhythmic arrangements, but the player has to impressive within that structure to bring the raga to life."[৬] ক্লিন্টন ভারত সফরকালে বলেছিলেন, আগামী দিনের যে পৃথিবীর আমি স্বপ্ন দেখি তা হল শান্তি ও উন্নতির,

Scanned with CamScanner

যেখানে নৃতাত্ত্বিক ভেদাভেদ ভুলে সকলেই সম্মানের সাথে বাঁচবে। সকলেই নিজ ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে পরিচিতির স্বতন্ত্রতা নিয়ে বাঁচবে। এই বক্তব্য উদার কূটনীতির বার্তা বহন করেছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে ওয়াশিংটন সফরে গিয়ে বলেন, "Barriers to mutually enriching science and technology must be removed to promote creativity and knowledge to the full."[৭] মার্কিন রাষ্ট্রপতি সংস্কৃতি এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিবিড়তর করার জন্য। ২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা ভারত সফরে আসেন। তিনি ভারতের সাথে বিভিন্ন চুক্তি করেন ও ভারতকে নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী আসন প্রাপ্তির বিষয়ে সমর্থন করার কথা বলেন। এটা ঠিক যে কেবলমাত্র সরকার বনাম সরকার-এর মধ্যকার সম্পর্কই একমাত্র পথ নয়। বরং ট্র্যাক-টু ডিপ্লোমেসির মাধ্যমেই দু'দেশের জনগণ কাছাকাছি আসতে পারে। ২০১৪ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় যোগ দেওয়ার জন্য নিউইয়র্কে যান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে "natural global partner" রূপে ঘোষণা করেছে। নরেন্দ্র মোদী বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত—এই দুই গণতান্ত্রিক দেশই পারে বিশ্ব জুড়ে উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাত্রাকে বৃদ্ধি করতে। নরেন্দ্র মোদী বলেন, "The Indian-American community in the US is a metaphor for the possibilities of an environment that nurtures enterprise and rewards hard work." নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারে প্রবাসী ভারতীয় বা ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিকদের সামনে বক্তৃতা দিয়ে আগামী দিনে ভারতের উন্নতির সম্ভাবনা কতটা সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। ভারতে বিনিয়োগের জন্যও আহ্বান জানান। এক্ষেত্রে 'ট্র্যাক-টু' কূটনীতির কৌশল ব্যবহার করেছেন নরেন্দ্র মোদী। নরেন্দ্র মোদী সফর কালে বিভিন্ন ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ও শিল্পপতিদের সাথে যেমন বৈঠক করেন, পাশাপাশি নিউজার্সি রাজ্যের গভর্নর ক্রিস ক্রিস্টির সাথেও বৈঠক করেন। অর্থনৈতিক কূটনীতিকে নরেন্দ্র মোদী এই সফরে গুরুত্ব দিয়েছেন।

ভারত ও মার্কিন সম্পর্কের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় নরেন্দ্র মোদী ও বারাক ওবামার দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমে। এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৪, হোয়াইট হাউসে। দু'দেশের রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যকার শীর্ষ বৈঠকে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সন্ত্রাস দমন, প্রতিরক্ষা বিষয়ে সহযোগিতা, গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদান ও ইবোলা সংক্রমণসহ আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ দমনে প্রথম থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

Scanned with CamScanner

সাথে সহযোগিতা করার ব্যাপারে নরেন্দ্র মোদী উৎসাহ দেখিয়েছেন। শীর্ষ বৈঠকের সময়ে সন্ত্রাসদমনের ক্ষেত্রে মার্কিন সাহায্য পাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন নরেন্দ্র মোদী। এ বিষয়ে আমেরিকা ও ইসরায়েল অক্ষে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে ভারতের পক্ষ থেকে। মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব চাক হাগেল ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ উদ্যোগে অস্ত্র তৈরি করার প্রস্তাব দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভারত এখন বিশ্বের প্রথম অস্ত্র আমদানিকারী দেশ। ওয়াশিংটন নতুন দিল্লিকে প্রস্তাব দিয়েছিল যৌথ উদ্যোগে ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী জ্যাভেলিন ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করার জন্য। বিশ্বে একমাত্র ভারতকেই এই প্রস্তাব দিয়েছে আমেরিকা। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারতের বাজার ধরতে বেশ কয়েক বছর ধরে আগ্রহী আমেরিকা। কিন্তু সম্প্রতি ভারতের বায়ু সেনার ১২৬টি যুদ্ধ বিমান তৈরির বিপুল বরাত হাতছাড়া হয় ওয়াশিংটনের। যৌথ উদ্যোগ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরকে হাতিয়ার করে ভারতের প্রতিরক্ষা বাজারের বড়ো অংশকে নিজেদের দখলে নিতে চায় আমেরিকা। যৌথ বিবৃতিতে আফগানিস্তানকেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন ওবামা ও মোদী। আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা সরানোর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পরে পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা ISI-এর মদতে ভারত বিরোধী কার্যকলাপ শুরু হওয়ায় নরেন্দ্র মোদী উদ্বেগ প্রকাশ করেন। দু'দেশই যৌথ বিবৃতিতে এক সাথে চলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

Scanned with CamScanner